‘যাবার আগে মিটিয়ে নেব’ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তিনটি কবিতা

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

।। এক ।।

এমন একটা বয়েস আসে, আসে কবিদেরও, যখন সেই পর্বে অমোঘ তাড়না থেকেই নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে তাঁকে বলতে হয় কিছু-কিছু কথা। চূড়ান্ত উচ্চারণের সৌজন্যে তৈরি করে নিতে হয় নিজের মন, মুঠোর মধ্যে যেন অনেকটাই আলগা হয়ে আসে পূর্বতন প্রবণতার টুকরো-টাকরা, তত্ত্বকথা থেকে সরে গিয়ে পরিণত লগ্নে জীবনটাকে দেখে নিতে ইচ্ছে করে আরো একবার। এই ‘আরো একবার’ কথাটার মধ্যে আরো একটা পর্যায়ের আভাস, অধ্যায়ের ইঙ্গিত। দীর্ঘ জীবনের দাক্ষিণ্যে বলার কথা জমেও ছিল অনেক, তার কতটা কীভাবে বলা হল, আর বলতে গিয়েই বা কতটুকু জ্ঞাপন করা হল সত্যকে স্পর্শ করে, কিংবা অনুক্ত থেকে গেল আজো অনুভবের কোন গভীরতা, —এসব ‘নিজ হাতে নিজস্ব ভাষায়’ যেন ঝালিয়ে নিতে চান একসময়ের পদাতিক সুভাষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সকালবেলার উচ্চারণ দুপুর গড়িয়ে গোধূলিকে ছুঁলে যে সে বয়সী হয়ে উঠবে, এটাই তো কাঙ্ক্ষিত। মূল জায়গাটা হয়ত অনড়ই থাকে, কিন্তু সময়ক্রমে বিবর্তনটা আমাদের মেনেও নিতে হয় বাধ্যতায়। ‘পদাতিক’ কিংবা ‘ফুল ফুটুক’ পর্যায়ে তিনি যে ভাষাভঙ্গি নিয়ে কথা বলেছেন, ‘অগ্নিকোণ’ অথবা ‘কাল মধুমাস’-এ যা ছিল তাঁর বাক্‌প্যাটার্ন, কালান্তরে তার মধ্যে যে বদল ঘটে যাবে, এও তো প্রত্যাশিত, তবু অবশ্যমান্য সত্যটাও তো এই যে, সুভাষ আগাগোড়া সুভাষেরই অবিকল্প উদাহরণ, নিজস্ব মাতৃভাষা নিয়ে, আর কারুর কাছে নয়, তাঁর নিজের কাছেই তিনি সম্পূর্ণত ঋণী। সাধারণের কাছে আবেদন ঘনিয়ে তুলতে রাজনীতিসঙ্গত উচ্চারণকে একদিন তিনি যেভাবে বিন্যস্ত করতেন, হয়ত-বা ঝংকারসর্বস্বও করে তুলতেন কোনো কোনো ঘোষণাকে, তার মধ্যে উচ্চকিত দৃপ্তভঙ্গি যতটা ছিল, কবিতার গভীরতা সম্ভবত ততটা ছিল না। সেই

যে তাঁর নিপুণ ছন্দে সঞ্চারিত চতুরঙ্গ, 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য / এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা, / দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য / চিনে নেবে যৌবন-আত্মা'—আজকের পাঠক এর মধ্যে কতখানি কবিতাকে আবিষ্কার করে নিতে চাইবেন, হয়ত সন্দেহ আছে, সন্দেহ আছে এই কারণে যে, এই উচ্চারণের সততা বিষয়ে প্রশ্নহীন থেকেও আমরা ছন্দ-মিলের ঝংকার ছাড়া, একটা আশাব্যঞ্জক রাজনৈতিক মতাদর্শ ছাড়া, বোধহয় গভীরতর অন্য কিছু কুড়িয়ে পাওয়ার অবকাশ খুঁজে নিতে পারি না তেমন করে। কিংবা ধরা যাক :

প্রান্তিক লোভে পরজীবীদের নিষ্ঠুর চোখ
প্রাক্‌পুরাণিক গুহাকে ডাকলো ক্ষুরধার নখ,
কমরেড, আশু অশ্বের ক্ষুরে আনো লাল দিন
দম্পতিরাত ততদিন হোক উৎসবহীন (চীন : ১৯৩৮)

তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি লাল টুকটুকে দিন (লাল টুকটুকে দিন)

এই যে অনুপ্রাসবিদ্ধ অলংকৃত বাচনচরিত্র, স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাসের জোয়ার থাকা সত্ত্বেও, যেন তেমন করে স্পর্শ করতে পারল না কবিতার সেই উত্তুঙ্গ শিখর। কিন্তু এই সত্যটাই চূড়ান্ত নয়। সুভাষ আগাগোড়া এইভাবে কথা বলেন নি, চলতে চানও নি। কথ্যভাষার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল প্রথমাবধিই, এবং সেই কারণেই তিনি অজস্র কবিতায় লোকসাহিত্য, ছড়া ও রূপকথার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন বিরল দক্ষতায়। পুরনো মিথ্‌কেও স্থাপন করেছিলেন সাম্প্রত প্রেক্ষিতে। পরবর্তী সময়ে যে তিনি কথ্যভাষার ক্যাজুয়াল আদল থেকে সরে এসেছেন এক পা, কিংবা ছন্দ-মিলের কারবার থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন তাঁর দু-হাত, তা তো নয়, বরং এই জায়গাগুলোই তাঁর জোরের জায়গা, প্রত্যয়ের ভূমি। বদল ঘটেছে অন্যদিকে, কথ্যভাষাকে আরো নিরাভরণ ক'রে তিনি তার শরীর থেকে ঝরিয়ে দিতে চেয়েছেন বাড়তি মেদ, আর আপাতসরল ভঙ্গিমার সঙ্গে তাঁকে মিশিয়ে দিতে দেখেছি জীবনসায়াহ্নের অতলান্ত কিছু অনুভব :

নিজেকে আমি খালি বলেছি, বাপু হে...
আর তো প্রায় মেরে এনেছিস
যাবজ্জীবন মেয়াদ
স্বয়ম্ভুর ব্যূহে

নামিয়ে রেখে ঘানির ভার
চোখের ঠুলি খুলে এবার
মনের সুখে দে শিস্

আর তো প্রায় মেরে এনেছিস
যাবজ্জীবন মেয়াদ

সামনে থেকে সরিয়ে ফেল গারদ
ক্ষণেক হাতে দড়ি যেমন,
হাতেও চাঁদ ক্ষণেক
সারাজীবন
দেখেওছিস অনেক (বাপু হে)

এ কবিতা ১৯৯১-এর 'ধর্মের কল' থেকে। জীবনের প্রান্তে পৌঁছে, সকলে নয় কেউ কেউ এভাবেই আবার ফিরে তাকাতে চান পেছনের জীবনটার দিকে, আর সামনে রইল যে-জীবন তাকে উপহার দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে অভিজ্ঞতা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া একেকটা দিনের যাবতীয় সঞ্চয়। 'দেখেওছিস অনেক' একটা সময় হাত মেলায় বাকি যা দেখার আনছে, তার সঙ্গে। এই দুই জীবন মিলেই কবির মেয়াদ, এই দুয়ে মিলেই কবিতার বোঝাপড়া।

।। দুই ।।

ওপরের বক্তব্যগুচ্ছের নির্ভরতা থেকেই সুভাষের তিনটি কবিতার নির্বাচন। প্রথম নিবেদন 'হিংসে', 'একটু পা চালিয়ে ভাই' থেকে। শোনা যাক কবিতাটির আদ্যন্ত :

যাবার আগে মিটিয়ে নেব
যার যার সঙ্গে আড়ি

উঠলে ঝড় ছুটব বাইরে
তারপর তো বাড়ি

ঠিক করি নি কিসে যাব
হেঁটে না সাইকেলে

ঝনঝনালে পকেটে পয়সা
মাটিতে দেব ফেলে

মাটি কাঁপছে, কাঁপুক—
চলরে রে ঘোড়া
হাতে তুলেছি চাবুক

মুখপুড়িটা তাকাচ্ছে দ্যাখ
বলছে, আ মর মিন্‌সে

ও কিছু নয়, বুঝলি নারে
হিংসে হিংসে হিংসে।

জীবনের সব পাট চুকিয়ে চলে যাওয়ার আগে সমস্তরকম মনকষাকষি মান-অভিমান মিটিয়ে ফেলতে চাইছেন কবি। ভুল বোঝাবুঝির অবসান তাঁর কাম্য, একটা সহজ মনের জগৎ তাঁর কাঙ্ক্ষিত, যেখানে বিরোধ নেই, সংঘর্ষ নেই, সংঘাতের কালো ছায়া নেই। ঠিক এরকম একটা আকুলতা থেকেই কবিতাটিকে শুরু করতে চেয়েছিলেন তিনি, এবং হয়ত শুরু করার সময়েই তাঁর মনে হয়েছিল, সহজ কথাটা সহজ ছন্দে, সহজতর চালে পেশ করলেই বিদ্ধ করা যাবে পাঠকের মন। পাঠক হিসেবে আমরাও মানসিকভাবে আগাম তৈরি হয়ে উঠি, সুভাষের কবিতাকে পাঠের সঙ্গী করতে চলেছি, অতএব অনাড়ম্বর নির্ভার কথ্যচালের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে সূচনা থেকেই। যে-জীবনটাকে ফেলে আসতে হয়েছে, আর বাকি রইল জীবনের অনাগত যে-অধ্যায়, এই দুই সত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মহত্তর আরেক সত্যকে মান্য করতে হচ্ছে কবিকে। আজ বাদে কাল একদিন এসব ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর এই চলে যাওয়ার আগে চুকিয়ে ফেলতে হবে সকলের সঙ্গে যাবতীয় বিবাদ-বিসংবাদ, বিদ্বেষ-বিরোধ, অবনিবনা-মতান্তর। সমস্ত মতবিভেদের নিষ্পত্তিই তো জটিল জীবনেরও মীমাংসা। 'বাড়ি' কি তারই প্রতীক, শেষ আশ্রয়ের অনুষঙ্গ? আর কীভাবেই বা এই যাওয়া, শ্লথ পদচারণায়, নাকি দ্রুতচারী এই সাইকেলে? যেতে তাঁকে হবে, কিন্তু এখনো যেন তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি, 'কিসে যাব?' যেন এই নির্বাচন তাঁর আয়ত্তের মধ্যেই, হাত তুলে ভাগ্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে তিনি নারাজ। 'ঠিক করি নি' এই ছোট্ট ক্যাজুয়াল বাক্যবন্ধটির মধ্যে কবির প্রত্যয়ী আত্মবিশ্বাস অপ্রকাশ্য থাকে না। আর 'ঝনঝনালে পকেটে পয়সা / মাটিতে দেব ফেলে' যেন জাগতিক সমস্ত মায়াপাশ ছিন্ন করে, একমাত্র নিঃস্বতা ও নিঃসঙ্গতাকে সম্বল করে চলে যাওয়ার এক মর্মান্তিক ছবি।

'মাটি কাঁপছে, কাঁপুক'—হয়ত বিদায়লগ্নে একটু অস্থির হয়ে উঠছে পায়ের তলার মাটি, নড়ে উঠছে সমগ্র অস্তিত্ব, কিন্তু তা বিচলিত করার মত নয়, কবির বিশ্বাস তাতে টলে যাবে না, কারণ অশ্বারোহী কবির হাতে নিবদ্ধ রয়েছে দাপট-জাগানো এক চাবুক, আর এই চাবুক তাঁকে নির্ভীক করে তুলেছে দশগুণ। পঞ্চম স্তবকে এসেই আমরা বুঝে নিতে পারি, হেঁটে বা সাইকেলে কোনোভাবেই যাত্রা শুরু করার ইচ্ছে বোধহয় কবির ছিল না, তাই 'চল্‌রে ঘোড়া', অশ্বারূঢ় হতেই তাঁর বাসনা। আর সাইকেলের থেকেও অনেক বেশি দ্রুতির প্রতীক ওই ঘোড়া, প্রতীক রোমাঞ্চেরও। ঘোড়ার অনুষঙ্গে চাবুকের উল্লেখটাও অনিবার্য।

শেষ দুটি স্তবক বড় তীব্রভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপস্থাপনার গুণে। এর আগে পর্যন্ত কবিতাটি দাঁড়িয়েছিল একভাবে, এবার যেন চাবুকের ঘায়ে তার ঘাড় ঘুরে গেল অন্যদিকে। 'মুখপুড়িটা তাকাচ্ছে দ্যাখ'—কে বলছেন এই কথা? বলছেন কবিই তো, কোনো একজন বয়স্কাকে সম্বোধন ক'রে বলছেন তিনি, কবিকে গালমন্দ করতে করতে যিনি ভুগে মরছেন হিংসের আগুনে। কিন্তু কেন এই হিংসে? কবি সব মায়া মোহ পেছনে ফেলে চলে যাওয়ার মত একটা মন তৈরি করতে পেরেছেন বলে, যা পারেন নি ওই বয়সিনী? আসক্তি নিয়ে যিনি জাগতিক জীবনে লিপ্ত হয়ে আছেন বেশি, নির্মোহ হয়ে যিনি ছেড়ে চলে যেতে চান না সহজে, নিরাসক্ত একজন মানুষের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষাবশে তিনিই তো বলে উঠতে পারেন, 'আ মর মিন্‌সে'। আর শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে এসে কবিতাটি জীবনের দিকে, জীবনের উষ্ণতার দিকে, হয়ত বা এক গভীর জীবনদর্শনের দিকেও মুখ ফিরিয়েছে। 'ও কিছু নয়, বুঝলি নারে'—এই ঢিলেঢালা আলগা ঢঙের বাক্‌প্রক্ষেপণের পাশাপাশি 'হিংসে'-র মত একটা হিংসুটে শব্দের তিনবার পুনরাবৃত্তিতে কবিতাটি অর্জন করে নিতে পেরেছে অন্যমাত্রিক এক তাৎপর্য।

।। তিন ।।

'একটু পা চালিয়ে, ভাই' থেকেই নির্বাচিত আমার দ্বিতীয় নিবেদন 'ঝুলতে ঝুলতে' :

এখন আমার হাড়ে দুব্বো গজাচ্ছে
শিরদাঁড়ার ব্যামোয়।
ভিড়ের বাসে এক পায়ে ঝুলতে ঝুলতে
শিরায় টান ধরে
মুঠো যখন আলগা হয়ে আসে

টেলিগ্রাফের তারে
বৃষ্টির শেষে জলের ফোঁটার মত
যখন আমি টলমল করি
ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে
আমার খুব কষ্ট হয়।

আমি আজও মনে করে রেখেছি
বড়দের সেই বারণ :
চলন্ত গাড়ি থেকে পেছনদিকে মুখ ক'রে
কক্ষনো নামতে নেই।

আমার যে বন্ধুরা পৃথিবীকে বদলাবে বলেছিল
ত্বর সইতে না পেরে
এখন তারা নিজেরাই নিজেদের বদলে ফেলছে।

আমি এক পায়ে এখনও পা-দানিতে ঝুলছি।
মুঠো আল্‌গা হয়ে এলেও, আমার কপাল ভালো,
ঘাড় ফিরিয়ে
কিছুতেই তাকাতে পারছি না।

আবার আরেকটি ভারাক্রান্ত বয়েসের ছবি, হাজার বদলের মধ্যেও অপরিবর্তনীয় প্রবণতার একটি খণ্ডাংশ, পেছন দিকে তাকাতে-তাকাতেও একবার ঝালিয়ে নেওয়া বন্ধুপৃথিবীর দু-একটি অনুজ্ঞা-অনুরোধ। ভাবতে ভাল লাগে, অগ্রজদের বন্ধুজনোচিত নির্দেশনামাকে প্রাণপণ মান্য করেই জীবনযাপন করতে চেয়েছেন তিনি। আয়ুর অনতিদূরে পৌঁছে এখন তাঁর মুঠো আল্‌গা হয়ে আসছে, টান ধরছে শিরায়, 'হাড়ে দুব্বো গজাচ্ছে' সময়ের নিয়মে। ভিড়ভর্তি বাসে শিরদাঁড়ার ব্যামোয় এখন পা-দানিতে ঝুলতে ঝুলতে ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাতে বেশ কষ্ট হয় তাঁর। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্যভাবে বুঝি পেছনেই তাকাতে হয় তাঁকে, ঘাড় ঘুরিয়ে নয়, দৃষ্টি ঘুরিয়ে। অতীতের দিকে, হারানো বান্ধবদের দিকে, বড়দের বারণের দিকে। যে-বয়েসটায় উপনীত হয়ে তাঁকে লিখতে হয় এ

কবিতা, যে-বয়েসটায় শরীরই ক্রমশ প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠতে চায় ভেতরে-ভেতরে, দৈনিক হাজারটা গ্লানি থেকে উঠে আসে ক্লান্তি আর অনিশ্চয়তা, তার একটি অনুপম ছবি উপস্থিত হল শান্ত বাক্‌প্রতিমার সূত্রে :

টেলিগ্রাফের তারে
বৃষ্টির শেষে জলের ফোঁটার মত
যখন আমি টলমল করি

ঠিক তখনই তাঁর মনে পড়ে যায় বয়স্কদের নিষেধাজ্ঞার কথা : চলন্ত গাড়ি থেকে নামার সময় পেছন দিকে মুখ ক'রে নামাটা অবিবেচকী কাজ। সে কাজে সারাজীবনে তাঁর নিজেরও কণামাত্র সায় ছিল না। আর ছিল না বলেই শুধুমাত্র চলমান গাড়ি থেকেই নয়, জীবনের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে সটান সামনে মুখ রেখেই সতর্কতায় নামা-ওঠা করতে চেয়েছেন তিনি। ভুল করেন নি সঠিক পদক্ষেপ নিতে, প্রতিজনের দূরদর্শিতাকে সম্বল করে এগিয়ে যেতে পেরেছেন অভ্রান্ত পথে।

কিছু অঙ্গীকার ছিল, ছিল স্বপ্ন, শপথ, এবং সেই সঙ্গে ছিল লালন করবার মত মানসদৃঢ়তা, সাহসী সত্তা :

আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে (সকলের গান)

ছেঁড়া জুতোটার ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে
শেষে নিই মন কাব্যের প্রতিপক্ষে (রোম্যান্টিক)

বুঝেছি দগ্ধ জীবনের দৃষ্টান্তে—
প্রাণ বাঁচানোর নেইকো সহজ পন্থা,
বজ্রমুঠিতে শৃঙ্খল হবে ভাঙতে,
আমাদের ফাঁকা ভাঁড়ার প্রেমের হন্তা (কাব্যজিজ্ঞাসা)

হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার
শপথ আমার : মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার
আত্মদানের; স্বপ্ন একটি—পৃথিবী গড়ার (দীক্ষিতের গান)

'পৃথিবী গড়ার' এই প্রতিশ্রুতি কি একটা সময় ব্যর্থ হয়ে গেল, দীক্ষিতের গান আর হয়ে উঠতে পারল না সকলের গান, মিছিল থেকে একে একে মিলিয়ে গেল অনেক মুখই? সেই সঙ্গে কি ধরা পড়ল অনেক চোরাস্রোত? 'কাল মধুমাস'-এর 'এই জমি' কবিতাটিতেও ছিল এই স্বপ্নভঙ্গেরই সংকেত : 'এই অন্ধকারে সেই বীভৎস মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি— / একদিন কথা দিয়ে যারা আমাকে ভুলিয়েছিল।' আর এমন ইঙ্গিতই যেন ধরা রইল বর্তমান

কবিতাটির পঞ্চম স্তবকে : পৃথিবীকে বদলে ফেলবে বলে যারা একসময়ে সত্যবদ্ধ হয়েছিল, সমাজবিন্যাসে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে কৃতপণ ছিল যারা, তারা অগোচরে, অন্ধকারের অন্তরালে, অসহিষ্ণুতায় বদলে ফেলল নিজেদেরই, সততার সঙ্গে টিকিয়ে রাখতে পারল না আত্মকৃত সংকল্পের এতটুকু।

শেষ স্তবকে কবি নিঃসঙ্গ, অনেকটাই যেন বান্ধবহীন। শুভার্থীদের নিষেধাজ্ঞায় তাঁর আস্থা অটুট ছিল, কিন্তু সমবয়সী সহযোগীদের শপথভঙ্গে তিনি নিরাশ না হয়ে পারেন নি। তাই বলে তিনি যে নিশ্চল স্থাণু হয়ে থাকবেন, তা তো নয়, 'আমি এক পায়ে এখনও পা-দানিতে ঝুলছি', তাঁর যাত্রা আজো অব্যাহত; 'এখনও' মানে কটপবেশী বন্ধুপরিজনের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার পরেও। 'পাদানিতে ঝুলছি' অবশ্যই প্রতীক-অনুষঙ্গ : মিথ্যাচারী জীবন-যানে বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েও যেন বেঁচে বর্তে থাকা। ওরই মধ্যে সামান্যতম সান্ত্বনাও তিনি খুঁজে নেন, অন্তত স্বগতকথনের মেজাজে বলে উঠতে পারেন, 'মুঠো আল্‌গা হয়ে এলেও 'আমার কপাল ভালো।' শুভাকাঙ্ক্ষীদের নির্দেশ তাঁকে অন্তত একটা ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তুলেছে : 'ঘাড় ফিরিয়ে / কিছুতেই তাকাতে পারছি না।' যেখানে সামনে এগিয়ে যাওয়াটাই ঈপ্সিত, সেখানে ভুলবশত পেছন দিকে তাকানোর মধ্যে অর্থ কী থাকতে পারে?

।। চার ।।

শেষ নির্বাচন **'ধর্মের কল'** থেকে কবিতাটি **'যেতে বললে'** :

কেউ যেতে বললে হয়
আমি অমনি
এক পায়ে খাড়া

যাবার জন্যে মন উচাটন হয়
কান খাড়া ক'রে থাকি
হয়ত কেউ
এখুনি দরজায় কড়া নাড়বে

দূর, কোথায় কী
জানলার পর্দা
হাওয়া কোঁচড়ে নিয়ে খেলা করে

পায়ের চটিটার দিকে তাকাই
যেমন ছিল
এখনও সেই অক্ষয় অব্যয়

ফতুয়াটা এখনও আনকোরা
বিড়ির আগুনে দগ্ধানো

শুধু কয়েকটা জায়গা

বললেই যাই
চোখের পাতা ফেলতে যা সময়
সেজেগুজে ফিটফাট
আমি তৈরি।

পাঠককে অনুরোধ করি, ঐ গ্রন্থেরই ঠিক আগের একটি কবিতা 'এখন কে যায়?' একবার এক ঝলকে পাঠ করে নিতে। বয়েসের উপান্তে পৌঁছেই তো হাজারগুণ বেড়ে যায় মানুষের জীবনাসক্তি, সব ছেড়ে চলে যেতে চায় না মন। বাজারে ফুলকপি শেষ হয়ে এলেও যে উঠবে-উঠবে করছে নতুন পটল কিংবা রঙের বাক্স খুলে মেঝের মাঝখানে সাদা কাগজ চিতিয়ে যে বসে পড়েছে তাঁর দুই নাতনি, এসব উপাদেয় দৃশ্যের শেষটুকু না দেখে কারই বা চলে যেতে ইচ্ছে করে? আর সবার ওপরে—

কুড়ি পেরিয়ে একুশে পা দেবে
আমাদের বড় আদরের এই শতাব্দী
আমি উনুনে চড়িয়েছি
তার জন্মদিনের পায়েস
ঘুমপাড়ানী মাসিপিসিরা
বুকের বাঁ দরজায় যতই
ঠক্‌ঠক্ করুক

এমন মজার খেলাঘর ছেড়ে
দূর! এখন কে যায়?

ঠিক এক্ষুনি যাওয়া নয়, যাওয়ার ইচ্ছেও হয়ত নেই তেমন, তবু যেতে হবে সব ছেড়ে, সেই মানসিক প্রস্তুতিটাই আসল। 'এখন কে যায়?' যিনি লিখতে পারেন, সঙ্গী-উচ্চারণ হিসেবে এর ঠিক পরে-পরে তিনিই লিখতে পারেন 'যেতে বললে'-র মত কবিতা। যিনি নিবিড় মায়াপাশে জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন আষ্টেপৃষ্ঠে, একটা সময় সমস্ত মায়া ছিন্ন করে নির্বেদ নিরাসক্তি নিয়ে তিনিই বোধহয় সকলের আগে বলে উঠতে পারেন, 'চললাম'। শুধুমাত্র কারুর বলার অপেক্ষাতেই থাকা, তারপর হুট্ বলতে বেরিয়ে পড়া, —এমন একটা বিষয়ভাবনা থেকে মৃত্যুচেতনার মোড়কে সবকিছুর উপস্থাপনা ঘটাচ্ছেন কবি এই কবিতার স্তরে, স্তরান্তরে। সেই অমোঘ ডাকে একদিন সাড়া দিতে হবে, তারই জন্য প্রতীক্ষা; কেউ কড়া নেড়ে উঠবে, তাই উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকা, উন্মুখতা নিয়ে প্রহর গোনা। মাঝে মাঝে শ্রবণবিভ্রম হয়, মনে হয় কেউ বুঝি এল, টোকা মারল জানলায়, পরক্ষণে ভুল ভেঙে যায়, কেউ না, 'দূর! কোথায় কী', হাওয়ার শব্দে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

চলে যাওয়ার আয়োজনে মনের উৎকণ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে কবির দৃষ্টি পড়ে চটিজোড়া,

ফতুয়া আর বিড়ির শেষটানে পোড়া ঘরের মেঝের দিকে। বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে ঘরোয়া আসক্তির নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। 'অক্ষয় অব্যয়', 'আনকোরা' এবং 'আগুনে দগ্ধানো' বিশেষণগুলি তিনটি গার্হস্থ্য বিশেষ্যের পক্ষে বুঝি সবচেয়ে যথাযথ। কিন্তু এই ঘন আনুরক্তি পেছনে ফেলে একই সঙ্গে উদাস বৈরাগ্য নিয়ে জ্ঞাপন করা 'বললেই যাই' বড় কঠিন জীবনদর্শন, কিন্তু সেই নির্বেদ প্রশান্তি থেকেই যেন তিনি অনায়াসে বলে উঠতে পারেন, কবিতার সূচনায় যেমন সমাপ্তিতেও তেমনি, 'আমি অমনি — এক পায়ে খাড়া' এবং 'সেজগুজে ফিটফাট / আমি তৈরি।' এই তৈরি হয়ে ওঠা, নিজেকে টানটান মানসিকতায় গুছিয়ে নেওয়া, 'যাবার জন্য মন উচাটন' হলে চূড়ান্তভাবে বিন্যস্ত করে নেওয়া যাবতীয় গৃহস্থালী, এই জীবনদর্শনকে পুঁজি করে জীবনের পাট চুকিয়ে ফেলাটাই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ বীক্ষা। আসক্তি নিয়ে লগ্ন থাকাটা যেমন জীবনের লক্ষণ, আসক্তি কাটিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে নিজেকে সমর্পণ করাও তেমনি জীবনদর্শনেরই আরেকটি পিঠ। সুভাষের কবিতাসম্পর্কিত গদ্যভাবনায় ছিল এরই প্রতিধ্বনি, 'এক জায়গায় ঠায় থাকলে দেখা যায় না। ঠাঁইনাড়া হয়ে তবেই দেখা যায়। পাঁচটা জিনিসের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকেল বাঁধনটা খুলতে হয়। তুলে আনতে হয়। ছাড়াতে হয়। আল্‌গা ক'রে দেখতে হয়।' আর তার জন্য অবশ্যম্ভাবীরকম জরুরি হয়ে ওঠে একটা বিশেষ প্রান্তিক বয়স, বয়সধর্ম। জীবনের বোঝাপড়ার সঙ্গে কবিতার বোঝাপড়াকে ঠিক এই বয়সেই মিলিয়ে দিতে চান কবি, পারেনও। এখন সেই বয়েস, যখন অবলীলায় তিনি বলে উঠতে চান :

ও মেঘ
ও হাওয়া
ও রোদ
ও ছায়া
যাচ্ছি (যাচ্ছি)

বলে উঠতে পারেন :

এখন সেই বয়েস, যখন
দূরেরটা বিলক্ষণ স্পষ্ট—
শুধু কাছেরটাই ঝাপসা দেখায়।
এখন সেই বয়েস, যখন
আচম্‌কা মাটিতে
পড়ে যেতে মনে হয়
হাতে একটা শক্ত লাঠি থাকলে ভালো হত। (এখন ভাবনা)

আর গদ্যের আশ্রয়ে তাঁকে সপ্রত্যয়ে বলে উঠতে শুনি : 'আমি আমার চটিটা ফট্‌ফট্‌ করতে করতে, চশমাটা মুছতে মুছতে, চেনা লোকদের 'কী খবর' বলতে-বলতে মিছিলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াই। মিছিলের ঠিক যে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি, সেখানে আমি একক। ঠিক একই জায়গায় দুজনের ঠাঁই হয় না। সকলের সঙ্গে থেকেও এক জায়গায় আমি নির্জন। আমি নিঃসঙ্গ।' (কবিতার বোঝাপড়া) ❑